

স্বাক্ষর: ফজলুল হক

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যাপীঠ নিয়ে কিছু কথা

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও তাদের মন পড়ে রয়েছে এ দেশে; নাকি আমাদের মন ভেসে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ-আমেরিকান আলা-বাতাসে! প্রসঙ্গত, মনে পড়ছে মাইকেল মধুসূদনের ইংল্যান্ডপ্রীতির কথা। বাংলাদেশের অনেক মানুষ যে এখনো বৈদেশিক মতো ইংরেজি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর, তার সাক্ষ্য প্রমাণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠার হিড়িক এবং পাঠ্য দিয়ে সন্তানদের ওই সব স্কুলে ভর্তি করানোর অশুভ প্রতিযোগিতা। বিষয়টি যে আমাদের এই দরিদ্র দেশে মানসিক বিভ্রান্তি, অশান্তি আর বিভিন্ন অন্যায্য-দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে, তা একটু চোখ-কান খোলা রাখলে সহজেই অনুভূত হবে।

দেশের বেশির ভাগ সরকারি প্রাইমারি স্কুলের অবস্থা খুবই নাজুক; কোনো কোনো স্কুলে ঘর নেই, নেই চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, ক্লাস চলে গাছতলায়; কোথাও দেখা যায় স্কুল ভবনের নির্বিড়মনে বিচরণ করছে গরু-ছাগল; কোনো স্কুলে হয়তো দেখা যাবে শিক্ষক নেই; আবার কোথাও কোথাও নেই কোনো শিক্ষার্থী। আধাসরকারি বা বেসরকারি অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব বেশি ভালো নয়; বেতনের জন্য এখনো হাজার হাজার শিক্ষক পথ চেয়ে বসে আছেন। কখনো কখনো বেতন-ভাতার জন্য আমাদের শিক্ষকসমাজকে অনশনের মতো অবমাননাকর কর্মসূচিতেও অংশ নিতে দেখা যায়। তার ওপর আমাদের দেশের অসংখ্য শিশু এখনো ন্যূনতম শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আর্থিক অনটন কিংবা সামাজিক-রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার কারণে বহু পরিবার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। এই যখন আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার চালচিত্র, তখন ব্যাভে হাজার মতো গঞ্জিয়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। রকমারি বিজ্ঞাপনে তারা আকর্ষণ করছে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের; শুধু নিচ্ছে তাদের পকেটের অর্থকড়ি। যত্রতত্র বাড়ি নির্মাণ করে কিংবা ভাড়া নিয়ে তৈরি হচ্ছে এসব স্কুল। যার দিক থেকে সামান্য না হলেও জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক-সম্বন্ধ কিংবা জাতীয় অগ্রগতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতা কতটুকু আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এই স্কুলগুলো তৈরি করে চলেছে ভিনদেশি নাগরিক; যারা পড়াশোনার একটা অংশমাত্র এখানে সম্পন্ন করে পাড়ি জমাবে ভিনদেশের মাটিতে। আমার কেবলই মনে হয়, এই যে আমরা আমাদের সন্তানদের অন্য দেশের নাগরিক বানানোর চেষ্টায় মগ্ন হয়েছি; আপন অস্তিত্ব এবং কর্তব্য ভুলে নিশ্চিতে খোঁয়াচ্ছি সন্তাননা।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো প্রকৃত পক্ষে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে না; তারা ইংরেজদের কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ দিচ্ছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীসমাজের একাংশকে। সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করার পাশাপাশি এ প্রক্রিয়াটি বিস্তার করছে অপরাধপ্রবণতাও। উচ্চবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

নেমে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের সাংসারিক ব্যয়ের বিরাট অংশ ঢেলে দিচ্ছে সন্তানদের বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজে। পরিবারের অন্যান্য চাহিদার টাকা এ খাতে বিনিয়োগ (সত্যি বিনিয়োগ কি!) করায় পারিবারিক জীবনেও আঘাত হানছে নানান সমস্যা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো বাংলাদেশি সংস্কৃতির ওপরও অনেক ক্ষেত্রে ফেলছে নেতিবাচক প্রভাব। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কৃত্রিমভাবে আয়ত্ত করছে ভিনদেশি সংস্কৃতি; দূরে সরে পড়ছে আপন ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির উদার জমিন থেকে। অন্যরা বাংলাদেশের স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝেতে; একপ্রকার অবোধ স্বপ্ন নিয়ে যোগ দেয় বাংলা মিডিয়াম কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় নামক তাদের ভীষণ অপছন্দের বিদ্যায়তনে। এ পরিণতির শিকারে পরিণত হয় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা।

বাস্তবতা হলো, ইংলিশ মিডিয়াম নামধারী এসব স্কুল ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা কী, তাই আমাদের জোলাতে বসিয়েছে। এ কারণে প্রকৃত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো এখন ইংলিশ ভাষার নামের আড়ালে স্বর্ণ পা নিয়ে কোনোরকমে টিকে আছে। টেক্সট বুক বোর্ডও হিমশিম খাচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী ইংরেজি অনুবাদের বই রচনা ও সরবরাহ করতে। স্কুলগুলো নিজ উদ্যোগে ব্রিটেন-আমেরিকা কিংবা ভারতে প্রকাশিত বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিক্রি করছে; কখনো কখনো মূল বইয়ের ফটোকপি সরবরাহ করা হয়। অন্য দেশের বই পড়ে আমাদের শিশুরা ডলার-রুপির হিসাব বুঝলেও তাদের অজানা থেকে যায় টাকা সম্পর্কে ধারণা; আর শেজাপিয়ার, এলিয়েটের টেক্সট পড়লেও তারা লাভ করে না রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দবিষয়ক পরিচিতি। বাংলা ভাষার লিখিত প্রয়োগ কিংবা পঠনশৈলীও এদের অনেকটাই অজানা থেকে যায়। জাতীয় কারিকুলামের পাঠ্য বিষয়বালি ইংরেজিতে শেখানোই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর লক্ষ্য; অর্থাৎ ইংরেজি মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষা। আমার মনে হয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনার অধীনে রেখে দেশীয় পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সাধারণ স্কুলের মতো এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরাও একই পড়া পড়বে; কেবল তারা পড়বে ইংরেজিতে। আর এর সঙ্গে সম্পূর্ণ শিক্ষা হিসেবে যুক্ত হতে পারে আন্তর্জাতিক বিষয়বালি। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষা শেখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সাধারণ স্কুলে ধারাবাহিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এটি করা গেলে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার সুযোগ লাভ করবে। এতে পরিবারে তথা

সমাজে অর্থনৈতিক চাপ কমানোর পাশাপাশি সৃষ্টি হবে শিক্ষার শক্ত ভিত; সামাজিক অস্থিরতা এবং অস্বাভাবিক ইংরেজিপ্রীতি হ্রাস পাবে অনেকাংশে।

ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার শিক্ষার নামে নানা উপায়ে বাংলাদেশ থেকে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে, প্রতিদানে বাংলাদেশকে কয়েকটি মাত্র কমন্ওয়েলথ স্কলারশিপ দিচ্ছে। বিশ্ববিস্তৃত শিক্ষাবাগিচা ব্রিটিশ সরকারের আয়ের এক বড় উৎস। যুক্তরাষ্ট্রেরও আছে বিশ্ববিস্তৃত শিক্ষাবাগিচা। তারা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে এমন সব লোক তৈরি করছে, যারা রক্তে ও রঙে বাংলাদেশি হলেও রুচিতে, পছন্দে, নৈতিক বিবেচনায় ও আচরণে ইংরেজ কিংবা আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে। এই দোআঁশলা লোকদের দিয়ে কী উপকার হচ্ছে বাংলাদেশের? রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহর ছাড়িয়ে ক্রমাগত এই বাগিচায়ের শাখা-প্রশাখা বর্তমানে মফস্বল শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সচিবেরা যেখানে বেতন পান ৪০ হাজার টাকারও কম, সেখানে কীভাবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো ভর্তি হি হিসেবে প্রায় লাখ টাকা নেওয়ার মতো কার্যক্রম নির্বাহে চালিয়ে যেতে পারে? যে দেশে সরকারি চাকরিরজীবীদের অধিকাংশের মাসিক বেতন ২০ হাজার টাকার নিচে, সে দেশে শিশুদের জন্য পরিচালিত এসব স্কুল কী করে মাসে ১০-১২ হাজার টাকা বেতন নির্ধারণ করতে পারে—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না। আমার কেবলই মনে হয়, আমরা ইংরেজি শেখার নামে উলু বনে মুকো ছড়াচ্ছি না তো!

একটু সতর্কভাবে ভাবলে অনুধাবন করা যায়, বাংলাদেশের উচ্চবিত্তের একটি বিরাট অংশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রাথমিক পাঠ নিয়ে অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পাড়ি দেয়; ফলে দিন দিন আমরা হারাচ্ছি সম্ভাবনাময় জনশক্তি এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভা। আজকে হয়তো এ সমস্যাকে আমরা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না; কিন্তু একদিন এটিই জাতির জন্য বিরাট সংকট হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দেশের সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো, অধিদপ্তর, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, উন্নয়নকর্মী, সংবাদকর্মীসহ বিবেকবান-চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব এ বিষয়ে চিন্তা করা, মত প্রকাশ করা ও জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণ করা। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে দেশের নীতিনির্ধারক, প্রশাসক ও প্রগতিশীল ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান-সংগঠন এ বিষয়ে বিস্ময়করভাবে নির্বিকার। এভাবে নির্বিকার থেকে কিংবা ঘুমিয়ে থেকে অথবা ঘুমের ডান করে আর কতকাল আমরা অতিক্রম করতে পারব।

● ফজলুল হক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
snue90@yahoo.com